আলাম নাশরাহ

৯৪

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ দু'টিকেই এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

সূরা আদ্ দুহার সাথে এর বিষয়বস্তুর গভীর মিল দেখা যায়। এ থেকে মনে হয় এ সূরা দু'টি প্রায় একই সময়ে একই অবস্থার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মক্কা মু'আয্যমায় আদ্ দুহার পরেই এই সূরাটি নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটির উদ্দেশ্যও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দান করা। নবুওয়াত লাভ করার পর ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করার সাথে সাথেই তাঁকে যেসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, নবুওয়াত লাভের আগে তাঁকে কখনো তেমনি অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়নি। তাঁর নিজের জীবনে এটি ছিল একটি মহাবিপ্লব। নবুওয়াত পূর্ব জীবনে এ ধরনের কোন বিপ্লবের ধারণা তাঁর ছিল না। তিনি ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করার সাথে সাথেই দেখতে দেখতে সমগ্র সমাজ তাঁর দুশমন হয়ে যায়। অথচ পূর্বে এই সমাজে তাঁকে বড়ই মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হতো। যেসব আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গোত্রীয় লোকজন ও মহল্লাবাসী ইতিপূর্বে তাঁকে মাথায় তুলে রাখতো তারাই এখন তাঁকে গালিগালাজ করতে থাকে। মক্কায় এখন আর কেউ তাঁর কথা শুনতে প্রস্তুত ছিল না। পথে তাঁকে দেখলে লোকেরা শিস দিতো, যা তা মন্তব্য করতো। প্রতি পদে পদে তিনি সংকটের সম্মুখীন হতে থাকেন। যদিও ধীরে ধীরে এসব অবস্থার মোকাবেলা করতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু তবুও এই প্রথম দিকের দিনগুলো তাঁর জন্য ছিল বড়ই কঠিন এবং এগুলো তাঁর মনোবল ভেঙ্গে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল।

এ জন্য তাঁকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে প্রথমে সূরা আদ্ দুহা এবং পরে এই সূরাটি নাযিল হয়।

এই সূরায় মহান আল্লাহ প্রথমেই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন; আমি তোমাকে তিনটি বিরাট বিরাট নিয়ামত দান করেছি। এগুলোর উপস্থিতিতে তোমার মানসিক দিক দিয়ে ভেঙ্গে পড়ার কোন কারণ নেই। তার মধ্যে একটি হচ্ছে হৃদয়দেশ উন্মুক্ত করে দেয়ার নিয়ামত। দ্বিতীয় নিয়ামতটি হচ্ছে, নবুওয়াত লাভের পূর্বে যে ভারী বোঝা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল তা কি আমি তোমার ওপর থেকে নামিয়ে দেইনি? তৃতীয়টি হচ্ছে, সুনাম ও

সুখ্যাতিকে উঁচু আসনে প্রতিষ্ঠিত করার নিয়ামত। এই নিয়ামতটি তাঁর চেয়ে বেশী আর কাউকে দেয়া তো দূরের কথা তাঁর সমানও কাউকে কখনো দেয়া হয়নি। সামনের দিকের ব্যাখ্যায় আমি এ তিনটি নিয়ামত বলতে কি বুঝানো হয়েছে এবং এগুলো কত বড় নিয়ামত ছিল তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

এরপর বিশ্ব–জাহানের প্রভু তাঁর বান্দা ও রসূলকে এই মর্মে নিশ্চন্ততা দান করেছেন যে, সমস্যা ও সংকটের যে যুগের মধ্য দিয়ে তুমি এগিয়ে চলছো এটা কোন সুদীর্ঘ যুগ নয়। বরং এখানে সমস্যা, সংকট ও সংকীর্ণতার সাথে সাথে প্রশস্ততার যুগও চলে আসছে। এই এক কথাই সূরা আদ্ দুহায় এভাবে বলা হয়েছে ঃ তোমার জন্য প্রত্যেকটি পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভালো হবে এবং শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এমন সবকিছু দেবেন যাতে তোমার মন খুশীতে ভরে যাবে।

সবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, প্রাথমিক যুগের এসব কঠিন অবস্থার মোকাবেলা করার শক্তি তোমার মধ্যে সৃষ্টি হবে একটি মাত্র জিনিসের সাহায্যে। সেটি হচ্ছে ঃ নিজের কাজ–কর্ম থেকে ফুরসত পাবার সাথে সাথেই তুমি পরিশ্রম পূর্ণ ইবাদাত ও আধ্যাত্মিক সাধনায় লিপ্ত হয়ে যাও। আর সমস্ত জিনিসের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের রবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো এটি সেই একই উপদেশের পুনরাবৃত্তি যা সূরা মুয্যাম্মিলের ৯ আয়াতে আরো বেশী বিস্তারিতভাবে তাঁকে দান করা হয়েছে।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴿٨﴾

হে নবী! আমি কি তোমার বক্ষদেশ তোমার জন্য উন্মুক্ত করে দেইনি ?[১] আমি তোমার ওপর থেকে ভারী বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, যা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল।[২] আর তোমার জন্য তোমার খ্যাতির কথা বুলন্দ করে দিয়েছি।[৩] আসলে সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও রয়েছে।[৪] অবশ্যই সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততাও রয়েছে। কাজেই যখনই অবসর পাও ইবাদাতের কঠোর শ্রমে লেগে যাও এবং নিজের রবেরই প্রতি মনোযোগ দাও।[৫]

১. এ প্রশ্নটি সহকারে বক্তব্য শুরু করায় এবং এর পরবর্তী বক্তব্য যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে তা থেকে প্রকাশ হয় ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করার পর প্রথম যুগে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব কঠিন বিপদ ও সমস্যার সম্মুখীন হন সেগুলো তাঁকে ভীষণভাবে পেরেশান করে রেখেছিল। এ অবস্থায় আল্লাহ তাঁকে সম্বোধন করে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, হে নবী ! আমি কি তোমার প্রতি অমুক অমুক মেহেরবানী করিনি ? তাহলে এই প্রাথমিক সংকটগুলোর মুখোমুখি হয়ে তুমি পেরেশান হচ্ছো কেন ?

কুরআন মজীদের যেসব জায়গায় বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে দেবার শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে সেগুলোর দু'টি অর্থ জানা যায়। এক, সূরা আন'আমের ১২৫ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ "কাজেই যে ব্যক্তিকে আল্লাহ হেদায়াত দান করার সংকল্প করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।" আর সূরা যুমারের ২২ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَّبِّهِ –

"তাহলে কি যার বক্ষদেশ আল্লাহ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তারপর যে তার রবের পক্ষ থেকে একটি আলোর দিকে চলেছে......................?"

এই উভয় স্থানে বক্ষদেশ উন্মুক্ত করার অর্থই হচ্ছে, সব রকমের মানসিক অশান্তি ও সংশয় মুক্ত হয়ে একথার ওপর নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া যে, ইসলামের পথই একমাত্র সত্য এবং ইসলাম মানুষকে যে আকীদা-বিশ্বাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নৈতিকতার যে মূলনীতি এবং যে হেদায়াত ও বিধিবিধান দান করেছে তা সম্পূর্ণ সঠিক ও নির্ভুল। দুই, সূরা শু'আরার ১২-১৩ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ যখন হযরত মূসাকে নবুওয়াতের মহান দায়িত্বে নিযুক্ত করে ফেরাউন ও তার বিশাল সাম্রাজ্যের সাথে সংঘাত-সংঘর্ষের হুকুম দিচ্ছিলেন তখন হযরত মূসা (আ) আরয করেন ঃ

رَبِّ اِنِّىٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ وَيَضِيْقُ صَدْرِى

"হে আমার রব! আমার ভয় হচ্ছে তারা আমাকে মিথ্যা বলবে এবং আমার বক্ষদেশ সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।"

আর সূরা ত্বা-হা'র ২৫-২৬ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْلِىْ اَمْرِىْ

"হে আমার রব! আমার বক্ষদেশ আমার জন্য খুলে দাও এবং আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও।"

এখানে সংকীর্ণতার মানে হচ্ছে, নবুওয়াতের মতো একটি মহান দায়িত্ব সম্পাদন করার এবং একটি অতি পরাক্রমশালী কুফরী শক্তির সাথে একাকী সংঘর্ষ মুখর হবার হিম্মত মানুষের হয় না। আর বক্ষদেশের প্রশস্ততার মানে হচ্ছে, হিম্মত বুলন্দ হওয়া, কোন বৃহত্তর অভিযানে অগ্রসর হওয়া ও কোন কঠিনতর কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে ইতস্তত না করা এবং নবুওয়াতের মহান দায়িত্ব পালন করার হিম্মত সৃষ্টি হওয়া।

একটু চিন্তা করলে এ বিষয়টি অনুভব করা যায় যে, এই আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে দেবার এ দু'টি অর্থই প্রযোজ্য। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে এর মানে হয়, নবুওয়াত লাভের পূর্বে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের মুশরিক, খৃস্টান, ইহুদী, অগ্নি উপাসক সবার ধর্মকে মিথ্যা মনে করতেন আবার আরবের কোন কোন তাওহীদের দাবীদারের মধ্যে যে 'হানীফী' ধর্মের প্রচলন ছিল তার প্রতিও তিনি আস্থাশীল ছিলেন না। কারণ এটি ছিল একটি অস্পষ্ট আকীদা। এখানে সঠিক পথের কোন বিস্তারিত চেহারা দেখা যেতো না। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা আস সাজ্দার ৫ টীকায় আমি এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।) কিন্তু তিনি নিজে যেহেতু সঠিক পথ জানতেন না তাই মারাত্মক ধরনের মানসিক সংশয়ে ভুগছিলেন। নবুওয়াত দান করে আল্লাহ তাঁর এই সংশয় দূর করেন। তাঁর সামনে সঠিক পথ উন্মুক্ত করে মেলে ধরেন। এর ফলে তিনি পূর্ণ মানসিক নিশ্চন্ততা ও প্রশান্তি লাভ করেন। দ্বিতীয় অর্থটির দৃষ্টিতে এর মানে হয়, নবুওয়াত দান করার সাথে সাথে এই মহান দায়িত্বের বোঝা উঠাবার জন্য যে ধরনের মনোবল, সাহস, সংকল্পের দৃঢ়তা এবং মানসিক উদারতা ও প্রশস্ততার প্রয়োজন তা আল্লাহ তাঁকে দান করেন। তিনি এমন বিপুল ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হন, যা তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন মানুষের মধ্যে স্থিতি লাভ করতে পারতো না। তিনি এমন বাস্তব বুদ্ধি ও কলাকৌশলের অধিকারী হন, যা বৃহত্তম বিকৃতি দূর ও সংশোধন করার যোগ্যতা

রাখতো। তিনি জাহেলিয়াতের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে থাকা এবং নিরেট মূর্খ ও অজ্ঞ সমাজে কোন প্রকার সহায় সম্বল ও বাহ্যত কোন পৃষ্ঠপোষকতাহীন শক্তির সহায়তা ছাড়াই ইসলামের পতাকাবাহী হয়ে দাঁড়িয়ে যাবার, বিরোধিতা ও শক্রতার বড় বড় তুফানের মোকাবেলায় ইতস্তত না করার এবং এই পথে যেসব কষ্ট ও বিপদ আপদ আসে সবরের সাথে তা বরদাশ্‌ত করার যোগ্যতা অর্জন করেন। কোন শক্তিই তাঁকে নিজের অবস্থান থেকে এক বিন্দু সরিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখতো না। এই বক্ষদেশ উন্মোচন এবং হৃদয়ের অংগন প্রশস্ত করার অমূল্য সম্পদ যখন তাঁকে দান করা হয়েছে তখন কাজের সূচনা লগ্নে যেসব সমস্যা সংকল্প-বিপদ-কষ্ট দেখা দিয়েছে তাতে তিনি মর্মাহত হচ্ছেন কেন?

কোন কোন তাফসীরকার বক্ষদেশ উন্মুক্ত করাকে বক্ষ বিদীর্ণ করা অর্থে গ্রহণ করেছেন। মূলত এই মু'জিযাটির প্রমাণ হাদীস নির্ভর। কুরআন থেকে এর প্রমাণ পেশ করার চেষ্টা করা ঠিক নয়। আরবী ভাষার দিক দিয়ে বক্ষদেশ উন্মুক্ত করাকে (شرح صدر) কোনভাবেই বক্ষবিদীর্ণ করার (شق صدر) অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে না। আল্লামা আলূসী রুহুল মা'আনী গ্রন্থে বলেন ঃ

حمل الشرح فى الاية على شق الصدر ضعيف عند المحققين

"গবেষক আলেমগণের মতে এই আয়াতে উন্মুক্ত করাকে বক্ষবিদীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা একটি দুর্বল কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

২. কোন কোন মুফাস্‌সির এর অর্থ এভাবে নিয়েছেন যে, নবুওয়াত পূর্ব জাহেলী যুগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কিছু ত্রুটি করেছিলেন যেগুলোর চিন্তায় তিনি অত্যন্ত পেরেশান থাকতেন এবং যেগুলো তাঁর কাছে অত্যন্ত ভারী মনে হতো। এই আয়াতটি নাযিল করে আল্লাহ তাঁর এই ত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন বলে তাঁকে নিশ্চিন্ত করে দেন। কিন্তু আমার মতে, এখানে এই অর্থ গ্রহণ করা এক মারাত্মক পর্যায়ের ভুল। প্রথমত "বিয্‌রুন" (وزر) শব্দের অর্থ যে অবশ্যই গোনাহ হতে হবে তা নয়। বরং ভারী বোঝা অর্থেও এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তাই অযথা একে খারাপ অর্থে গ্রহণ করার কোন কারণ নেই। দ্বিতীয়ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত পূর্ব জীবনও এত বেশী পাক পরিচ্ছন্ন ছিল যার ফলে কুরআন মজীদের বিরোধীদের সামনে তাকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। তাই কাফেরদেরকে সম্বোধন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে একথা বলানো হয়েছে ঃ

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ "এই কুরআন পেশ করার আগে তোমাদের মধ্যে আমি জীবনের একটি বিরাট অংশ অতিবাহিত করেছি।" (ইউনুস ১৬ আয়াত) আবার সবাইকে লুকিয়ে গোপনে গোপনে একটি গোনাহ্‌ করবেন এমন ধরনের লোকও তিনি ছিলেন না। (নাউযুবিল্লাহ) এমনটি যদি হতো, তাহলে আল্লাহ সে সম্পর্কে অনবহিত থাকতেন না এবং নিজের চরিত্রে গোপন কলংক বহন করে ফিরছেন এমন এক ব্যক্তির মুখ দিয়ে সর্ব সমক্ষে সূরা ইউনুসের পূর্বোল্লিখিত আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে তা বলাতেন না। কাজেই আসলে এই আয়াতে "বিয্‌র" শব্দের সঠিক অর্থ হচ্ছে ভারী বোঝা। আর এই ভারী বোঝা বলতে নিজের জাতির মূর্খতা ও জাহেলী কর্মকাণ্ড দেখে তাঁর অনুভূতিপ্রবণ মন যেভাবে দুঃখ, ব্যথা, কষ্ট, দুশ্চিন্তা ও মর্মবেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে

উঠেছিল তাই এখানে বুঝানো হয়েছে। তিনি দেখছিলেন লোকেরা হাতে বানানো মূর্তির পূজা করছে। চারদিকে শিরক ও শিরক উৎপাদিত কল্পনাবাদ ও কুসংস্কারের ছড়াছড়ি নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও নৈতিক চরিত্রের অবনতি গোটা সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। সমাজে জুলুম, নিপীড়ন ও লেনদেনের ক্ষেত্রে বিপর্যয় ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। শক্তিশালীদের পাঞ্জার নীচে শক্তিহীনরা পিষে মরছিল। মেয়েদের জীবন্ত কবর দেয়া হচ্ছিল। এক গোত্র অন্য গোত্রের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে লুটতরাজ করতো। কোন কোন ক্ষেত্রে শত শত বছর পর্যন্ত চলতো প্রতিশোধমূলক লড়াইয়ের জের। কারো পেছনে শক্তিশালী দলীয় শক্তি ও মজবুত জনবল না থাকলে তার ধন, প্রাণ, ইজ্জত, আব্রু সংরক্ষিত থাকতো না। এই অবস্থা দেখে তিনি মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হতেন। কিন্তু এই গলদ দূর করার কোন পথই তিনি দেখছিলেন না। এই চিন্তাই তাঁর কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছিল। মহান আল্লাহ হেদায়াতের পথ দেখিয়ে এই বিরাট বোঝা তাঁর ওপর থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন। নবুওয়াতের দায়িত্বে সমাসীন হতেই তিনি জানতে পেরেছিলেন, তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের ওপর ঈমান আনাই এমন একটি চাবিকাঠি যা দিয়ে মানব জীবনের সব রকমের বিকৃতির তালা খোলা যেতে পারে এবং জীবনের সকল দিকে সংশোধনের পথ পরিষ্কার করা যেতে পারে। মহান আল্লাহর এই পথনির্দেশনা তাঁর মানসিক দুশ্চিন্তার সমস্ত বোঝা হালকা করে দিয়েছিল। এর মাধ্যমে তিনি কেবল আরবের নয় বরং আরবের বাইরে ও সমগ্র দুনিয়ার মানব সমাজ যেসব অন্যায় ও দুষ্কৃতিতে লিপ্ত ছিল তা থেকে তাদেরকে মুক্ত করতে পারবেন বলে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন।

৩. যে সময় একথা বলা হয়েছিল তখন কেউ কল্পনাও করতে পারতো না যে, মাত্র হাতেগোণা কয়েকজন লোক যে ব্যক্তির সংগী হয়েছে এবং কেবলমাত্র মক্কা শহরের মধ্যে যার সমস্ত কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ, তাঁর আওয়াজ আবার কেমন করে সারা দুনিয়ায় বুলন্দ হবে এবং কোন্ ধরনের খ্যাতিই বা তিনি অর্জন করবেন। কিন্তু এই অবস্থায় আল্লাহ তাঁর রসূলকে এ সুসংবাদ দিলেন এবং অদ্ভুত পদ্ধতিতে তা বাস্তবায়িতও করলেন। সর্বপ্রথম তাঁর নাম বুলন্দ ও তাঁর চর্চা ব্যাপক করার কাজ সম্পন্ন করলেন তিনি তাঁর শত্রুদের সাহায্যে। মক্কার কাফেররা তার ক্ষতি করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করলো। এর মধ্যে একটি পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ ঃ হজ্জের সময় আরবের সমগ্র এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক লোক মক্কা শহরে জমায়েত হতো। এ সময় কাফেরদের প্রতিনিধি দল হাজীদের প্রত্যেকটি তাঁবুতে যেতো এবং তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দিতো যে, এখানে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামে একজন ভয়ংকর লোকের আবির্ভাব হয়েছে। তিনি লোকদের ওপর এমনভাবে যাদু করেন যার ফলে পিতা–পুত্র, ভাই–ভাই, ও স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কাজেই আপনারা তার সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলবেন। হজ্জের মওসুম ছাড়া অন্যান্য দিনেও যারা কাবা শরীফ যিয়ারত করতে আসতো অথবা ব্যবসায় উপলক্ষে যারা মক্কায় আসতো তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে দুর্নাম রটাতো কিন্তু এর ফলে আরবের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায়ও তাঁর নাম পৌঁছে গেলো। মক্কার অপরিচিত গণ্ডীর ভেতর থেকে বের করে এনে শত্রুরাই সারা আরব দেশের বিভিন্ন গোত্রের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল। এরপর লোকদের মনে এই প্রশ্ন জাগা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, এই লোকটি কে? কি বলতে চায়? সে কেমন লোক? তার যাদুতে কারা প্রভাবিত হচ্ছে এবং তাদের ওপর তার যাদুর কি প্রভাব পড়ছে? মক্কার কাফেরদের

প্রচারণা যত বেশী বেড়েছে লোকদের মধ্যে এই জানার আগ্রহ তত বেশী বেড়েছে। তারপর অনুসন্ধানের মাধ্যমে লোকেরা তাঁকে জেনেছে। তাঁর চরিত্র ও কাজ–কারবারের সাথে পরিচিত হয়েছে। লোকেরা কুরআন শুনেছে। তিনি যেসব বিষয় পেশ করছেন সেগুলো জেনেছে। যখন তারা দেখলো, যে জিনিসকে যাদু বলা হচ্ছে, তাতে যারা প্রভাবিত হয়েছে তাদের জীবন ধারা আরবের সাধারণ লোকদের জীবনধারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে, তখন দুর্নাম সুনামে রূপান্তরিত হয়ে যেতে লাগলো। এমন কি হিজরতের আগেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেলো যার ফলে দূরের ও কাছের এমন কোন আরব গোত্রই ছিল না যার কোন না কোন লোক বা পুরা পরিবার ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং যার কিছু কিছু লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দাওয়াতের প্রতি সহানুভূতিশীল ও আগ্রহী হয়ে ওঠেনি। এটি ছিল তাঁর খ্যাতির কথা বুলন্দ হবার প্রথম পর্যায়। এরপর হিজরতের পর থেকে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়ে গেলো। এর মধ্যে একদিকে মোনাফেক, ইহুদি ও সমগ্র আরবের মুশরিক প্রধানরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুর্নাম রটাতে তৎপর হয়ে উঠলো এবং অন্যদিকে মদীনা তাইয়েবার ইসলামী রাষ্ট্রটি আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও আল্লাহ ভীতি, তাকওয়া, ইবাদাত, বন্দেগী, চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতা, সুষ্ঠু সামাজিকতা, ইনসাফ, ন্যায়নিষ্ঠা, মানবিক সাম্য, ধনীদের বদান্যতা, গরীবদেরকে সাহায্য সহায়তা দান, অংগীকার ও শপথ রক্ষা এবং মানুষের সাথে ব্যবহার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে সততার এমন বাস্তব নমুনা পেশ করছিল, যা মানুষের হৃদয় জয় করে চলছিল। শত্রুরা যুদ্ধের মাধ্যমে তাঁর এই বর্ধিষ্ণু প্রভাব বিলীন করতে চাইলো। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে ঈমানদারদের শক্তিশালী জামায়াত তৈরী হয়েছিল। নিয়ম–শৃংখলা, বীরত্ব–সাহসিকতা, মৃত্যুকে ভয় না করা এবং যুদ্ধাবস্থায়ও নৈতিক সীমারেখাকে কঠোরভাবে মেনে চলার মাধ্যমে এই জামায়াত নিজের শ্রেষ্ঠত্ব এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল যার ফলে সমগ্র আরব তার প্রভাবাধীন হয়ে গেলো। দশ বছরের মধ্যে তাঁর খ্যাতির কথা বুলন্দ হয়ে গেল। অর্থাৎ যে দেশে তাঁর বিরোধীরা তাঁকে বদনাম করার জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল তার সমগ্র এলাকায় এবং প্রত্যন্ত প্রদেশে ও সর্বত্র "আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" এর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। তারপর এই তৃতীয় পর্যায়টি শুরু হলো খোলাফায়ে রাশেদার শাসনামল থেকে। সে সময় তাঁর মুবারক নাম সারা দুনিয়ায় উচ্চারিত হতে লাগলো। এই সিলসিলাটি আজ পর্যন্ত বেড়েই চলছে। ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত বেড়ে যেতেই থাকবে। দুনিয়ার এমন কোন জায়গা নেই যেখানে মুসলমানদের কোন জনপদ নেই এবং দিনের মধ্যে পাঁচবার আযানের মধ্যে বুলন্দ আওয়াজে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের ঘোষণা করা হচ্ছে না, নামাযে রসূলুল্লাহর (সা) ওপর দরূদ পড়া হচ্ছে না, জুম'আর খুতবায় তাঁর পবিত্র নাম পাঠ করা হচ্ছে না এবং বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন সময় এমন নেই যখন সারা দুনিয়ার কোন না কোন জায়গায় তাঁর মুবারক নাম উচ্চারিত হচ্ছে না। নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে যখন আল্লাহ বলেছিলেন (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) (আর তোমার নাম ও খ্যাতির কথা আমি বুলন্দ করে দিয়েছি অর্থাৎ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে সম্প্রচার করেছি।) তখন কেউ একথা অনুমানই করতে পারতো না যে, এমন সাড়ম্বরে ও ব্যাপকভাবে এই নাম বুলন্দ করার কাজটি সম্পন্ন হবে। এটি কুরআনের সত্যতার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেছেন ঃ "জিব্রীল আমার কাছে আসেন। আমাকে বলেন, আমার রব ও আপনার রব জিজ্ঞেস করছেন ঃ আমি কিভাবে তোমার নাম বুলন্দ (رَفَعْ ذِكْرِ) করেছি? আমি আরজ করি, আল্লাহ ভালো জানেন। তিনি বলেন, আল্লাহর উক্তি হচ্ছে ঃ যখন আমার নাম বলা হয় তখন সেই সাথে তোমার নামও বলা হবে।" (ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, মুসনাদে আবু লাইলা, ইবনুল মুনযির, ইবনে হিব্বান, ইবনে মারদুইয়া ও আবু নু'আইম) পরবর্তীকালের সমগ্র ইতিহাস সাক্ষ দিচ্ছে, একথাটি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়েছে।

৪. একথাটি দু'বার বলা হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পুরোপুরি সান্ত্বনা দেয়াই এর উদ্দেশ্য। সে সময় তিনি যে কঠিন অবস্থা ও পর্যায় অতিক্রম করেছিলেন তা বেশীক্ষণ স্থায়ী থাকবে না বরং এরপর শিগ্‌গির ভালো অবস্থা শুরু হবে, একথা তাঁকে বুঝিয়ে দেয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। আপাত দৃষ্টিতে সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততা এবং দারিদ্র্যের সাথে সচ্ছলতা এ দু'টি পরস্পর বিরোধী জিনিস একই সময় একসাথে জমা হতে পারে না। কিন্তু তবুও সংকীর্ণতার পর প্রশস্ততা না বলে সংকীর্ণতার সাথে প্রশস্ততা এই অর্থে বলা হয়েছে যে, প্রশস্ততার যুগ এত বেশী নিকটবর্তী যেন মনে হয় সে তার সাথেই চলে আসছে।

৫. অবসর পাওয়ার অর্থ হচ্ছে, নিজের কাজকাম থেকে অবসর পাওয়া, তা ইসলামের দাওয়াত দেয়া ও ইসলাম প্রচারের কাজ হতে পারে বা ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে শিক্ষা ও তরবিয়ত দানের কাজও হতে পারে অথবা নিজের ঘরের ও বাইরের বৈষয়িক কাজও হতে পারে। এই নির্দেশটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন আর কোন কাজ থাকবে না তখন নিজের অবসর সময়টুকু ইবাদাতের পরিশ্রম ও সাধনায় ব্যয় করো এবং সবদিক থেকে দৃষ্টি ও মনোযোগ ফিরিয়ে এনে একমাত্র নিজের রবের প্রতি মনোযোগী হয়ে যাও।